প্রতিমাশিল্পের বিবর্তন

সুহাস মজুমদার

পুণ্যতোয়া, উন্নিদ্র ধ্যানে নিমগ্না গঙ্গা মোহনার পলিমাটি, রঙ, তুলি আর নিষ্কলুষ তন্ময়তাকে নির্ভর করে যে প্রতিমাশিল্পের সৃষ্টি, তার জন্ম এবং বিবর্তনের ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়।

তার কারণ, বৈদিক যুগে কিংবা তান্ত্রিক যুগে মূর্তিপূজার কোনও রেওয়াজ ছিল না। কেবল যজ্ঞের শেষে পূর্ণাহুতি দেবার পর ধ্যান করতে হত। বৈদিক যুগে স্বতন্ত্র কোনও দেবমন্দিরও ছিল না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ এবং গৃহস্থ ঘরই ছিল মন্দিরতুল্য। তান্ত্রিক যুগেও ওই বৈদিক পদ্ধতি অনুসৃত হত। কেবল তফাত ছিল, বৈদিক যজ্ঞে বেদি বানিয়ে তার উপর রেখাদি অঙ্কন করে যজ্ঞ বিশেষের হোমকুণ্ড নির্দিষ্ট হত। আর তান্ত্রিক যুগে তামার টাটের মধ্যে নানারকম যন্ত্র আঁকা কিংবা খোদাই করা থাকত, সেই টাট শুদ্ধ করে তান্ত্রিক যজ্ঞ করতে হত। এই টাটকে তাম্রকুণ্ড বলা হত। তান্ত্রিক যজ্ঞের সময়ে বীজমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বীজগত দেবতার ধ্যান করাই ছিল তন্ত্র নির্দেশিত রীতি। তন্ত্র প্রত্যেক মন্ত্র সহ এক একটা রূপের ধ্যান নির্দেশ করে দিয়েছে। তন্ত্র বলে, জপযজ্ঞে নাকি সিদ্ধিলাভ করতে পারলে ধ্যানগম্যা মূর্তি সাবয়বা ও সজীব হয়ে সাধকের সম্মুখে অবতীর্ণ হন।

দুর্গা, কালী, তারা, কমলা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি বীজমন্ত্রগতা ধ্যানের দেবতা, এঁদের স্বতন্ত্র সত্তা নেই। একই মহামায়ার আদ্যাশক্তির জপ ও যজ্ঞের প্রভাবে ভাবের ও রসের অভিব্যঞ্জনা মাত্র। তন্ত্রে স্পষ্ট করে বলা আছে, মা আমাদের শতরূপা, কোটিরূপা মহামায়া। জগতে যত সাধক, মায়ের তত রকমের রূপ। ফলে ভারতবর্ষের কোনও প্রাচীন মন্দিরে দেবতার রূপ নেই, আকার-অবয়ব নেই। কেবল আছে একখানা প্রস্তরখণ্ড।

তাই কাশীর অন্নপূর্ণা একখানা পাথর মাত্র। সেই পাথরের মাথায় একটা সোনার মুখ ও দুপাশে সোনার হাত বসানো আছে। বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরেও ওই একখানা যন্ত্রলিখিত পাথরই আছে। ভক্ত পাণ্ডারা তাঁদের অভিরুচি অনুযায়ী একেক সময় একেকটা রূপ দেবার চেষ্টা করেন। কালীঘাটের মা কালীর দিকে তাকালেও একই ব্যাপারে দেখা যাবে। একখানা কষ্টিপাথরের উপরে একটা নাক বসিয়ে, রূপার চোখ এঁটে, সোনার জিভ, সোনার হাত এবং সোনার মুণ্ডমালা গেঁথে এক অপরূপা কালীর সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন পুরনো মাতৃমন্দিরে, তেমনই শিবের মন্দিরে, কোনও মন্দিরেই রূপময়ী দেবতা প্রতিষ্ঠিতা নন। শিবের মন্দিরে বিরাজ করে কেবল অনাদি লিঙ্গ। তন্ত্রে আছে, শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা তন্ত্র বিরোধী। কারণ, শিব নাকি সর্ব আর মহামায়া সর্বাণী। ফলে বেদ, তন্ত্র, পুরাণ কোনোটাতেই মূর্তিপূজার উল্লেখ নেই।

মূর্তিপূজার প্রবর্তক ছিলেন বৌদ্ধরা। মহাযানী, বজ্রাযানী এবং কালচক্রযানীদের প্রভাবে

এক সময় উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত স্থানই পাথরের প্রতিমায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

প্রতিমাশিল্পের সূচনা এই বৌদ্ধদের আমলেই। তার প্রমাণ কাশীর কয়েকটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দিরের বেদির উপরে, যন্ত্রশিলার আসনের পাশে একটা করে বৌদ্ধ মূর্তি বসানো আছে।

আধুনিক যে প্রতিমাশিল্প তার জন্ম মাত্র ৮০০ বছর আগে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের হাতে ঘটেছিল। তিনিই প্রথম মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়ে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন। পরে ভাদুড়িয়ার মহারাজা জগৎনারায়ণ রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাসন্তী দুর্গোৎসব করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের কালপরবর্তী শ্রীচৈতন্য সেবকদের অভ্যুদয়ের সময় থেকে বাংলার মাটির প্রতিমা গড়ে পূজার প্রচলন বিপুলভাবে বিস্তারলাভ করে।

তবে প্রকৃত বিবর্তন বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেই ঘটেছিল। তাঁর আমলে যেমন দুর্গা প্রতিমায় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছিল তেমনই তাঁর কালে মাটির কালী প্রতিমা গড়ে কালীপূজার সূচনা হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বিবর্তন আরও ব্যাপকভাবে দেখা দিল। শুধু প্রতিমাশিল্পেই নয়, সমগ্র উৎসবের মধ্যেও এই বিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। ব্রিটিশ আমলের নতুন জমিদার, তালুকদার ও পত্তানিদাররা এবং হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বিত্তবান 'জেন্টুরা' এই বিবর্তনের হোতা ছিলেন।

সেকালে এই প্রতিমাশিল্পের বিবর্তনকে অনেকেই তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। হুতোম তাঁর নক্‌শায় (১৮৬২-তে প্রকাশিত) প্রতিমা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—'বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে সাজ আনিয়ে প্রতিমা সাজানো হয়। মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্তে বনেট পরেন, স্যান্ডউইচের শেতল খান, আর কলাবউ গঙ্গাজলের পরিবর্তে কাৎলীকরা গরম জলে স্নান করে থাকেন, শেষে সেই প্রসাদী গরম জলে কর্মকর্তাদের প্রাতরাশের টী ও কফি প্রস্তুত হয়।'

হুতোমের নক্‌শার পঞ্চাশ বছর পর (১৩২২ সালে) 'নারায়ণ' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন—'হাজার বৎসরের পূর্বেকার বাঙালী এবং এখনকার বাঙালীর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, তাই এখনকার সিংহবাহিনী এবং তখনকার সিংহবাহিনীতে আকাশ-পাতালের পার্থক্য ঘটিয়াছে। এ মূর্তি যে বাঙ্গালা দেশে কবে হইতে প্রচলিত হইল, তাহাও ভাবিয়া পাই না। কোনও মূর্ত্তিই তন্ত্রোক্ত ধ্যানের সহিত মিলান নহে। অমন টেড়িকাটা, তাজপরা বাবু কার্ত্তিক পুরাণ তন্ত্রের কোনও পৃষ্ঠায় নাই। লক্ষ্মী সরস্বতীর অমন রূপ ত কোথাও দেখিতে পাই না, তন্ত্রের ধ্যানে নাই, পুরাণের স্তব স্তোত্রে নাই। তাহার পর যে ভাবে মহিষাসুর মর্দ্দন হইতেছে, সে ভাবটাও—সে ভঙ্গীটাও পুরাণ ও তন্ত্রের কুত্রাপি খুঁজিয়া পাইবে না। তাহার পর চালচিত্র বা সূর্যমুখ-ছটা যাহা পিছনে থাকে, তাহারও বিন্যাস অপূর্ব পদ্ধতিতে করা হইয়াছে।'

শুধুমাত্র দুর্গা প্রতিমাতেই এই বিবর্তন আসেনি। পরবর্তীকালের কালী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, শিব প্রভৃতি সমস্ত প্রতিমাশিল্পের মধ্যেই বিবর্তনের ঢেউ এসে লেগেছে। সেকালে যেমন, একালেও তেমনই এক বিবর্তনের পরম্পরাকে এক শ্রেণীর পণ্ডিত ও সমালোচক কখনোই তেমনভাবে মেনে নিতে পারেননি।

একালে বিবর্তনের ধারায় প্রতিমাশিল্পের যে নবরূপায়ণ তাকে তথাকথিত পণ্ডিতেরা শিল্পে যথেচ্ছাচার ও ভ্রষ্টাচার বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলছেন, প্রতিমাশিল্প এখন বম্বের অভিনেত্রীদের অবয়ব মার্কা শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। কেউ কেউ আবার পুরাণ, তন্ত্র, বেদ প্রভৃতি থেকে নানান ব্যাখ্যাও তুলে ধরেছেন। মোদ্দা কথা, এই বিবর্তন নিয়ে কূট-কচালি সমানে চলেই আসছে।

তবে কি সত্যিই প্রতিমাশিল্পে ভ্রষ্টাচার ঘটছে, নাকি এটা বিবর্তনের বিরুদ্ধে এক ধরনের শুষ্ক পাণ্ডিত্যের শুধুই অপপ্রচার?

এসব জানতেই হাজির হয়েছিলাম কলকাতার কয়েকজন বিখ্যাত দেবশিল্পী বা প্রতিমাশিল্পীদের কাছে। যাঁদের গড়া মূর্তি দেখার জন্য আর কদিন বাদেই তাবৎ কলকাতা ভেঙে পড়বে নানান প্যাণ্ডেলে।

সত্তর ছুঁই ছুঁই রমেশ পাল আজও ভাস্কর্য ও প্রতিমাশিল্পে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে। আর্ট কলেজ থেকে চল্লিশের দশকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া একালের এই শিল্পীর প্রতিমা দেখার জন্য পঞ্চাশ দশকে ফায়ার ব্রিগেড কিংবা সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে যেভাবে লাখ লোকের ভিড় উপচে পড়ত—আজও তেমনি পড়ে। তাঁর গড়া ব্রোঞ্জের বিধানচন্দ্র রায়, মাতঙ্গিনী হাজরা, লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ কলকাতার গর্ব। শালপ্রাংশু এই শিল্পীর কাছে প্রশ্ন রাখতেই তিনি এভাবেই আরম্ভ করলেন—

'শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ভাস্কর্যের যাত্রা সুরু দেবশিল্প অর্থাৎ প্রতিমাশিল্প দিয়ে। এই শিল্পে আছে ভাস্কর্যের সুপ্রাচীন কৌলীন্য কাহিনি।

'আমি মূলত ভাস্কর। একটা সময় ছবি এঁকেছি তেলরঙে, জলরঙে। আর প্রতিমাশিল্পে ঘটেছে উভয়ের মিশ্রণ। গঙ্গা-মোহানার পলিমাটি রঙ, তুলি, মন আর মেজাজ—এই নিয়ে আবর্তিত হয় প্রতিমাশিল্পের জগৎ। এই জগতের দৌলত নিয়ে এতদিন চলে এসেছে তার বাইরের জগতের সঙ্গে লেনদেন, তারই আদি কথা একটু বলি। রূপের কথা, রসের কথা, শিল্পের কথা বলেই আমার কথায় কোনও চৌহদ্দি মাপা সীমারেখা থাকবে না।

'শিল্পীর নিষ্কলুষ তন্ময়তাকে নির্ভর করে ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে মূর্তিশিল্প, চিত্রশিল্প, প্রতিমাশিল্প, ভাস্কর্য। ধ্যান এসেছে ধারণায়। ধ্যানকে ধারণায় মিলিয়ে দেওয়াই হল শিল্পী ভাস্করের কাজ—আত্মার হিত সাধন।'

'এই সাধনা নিয়েই এতদিন তৈরি হয়েছে দেব-দেবীর প্রতিমা। এটাই ছিল স্ট্যান্ডার্ড। প্রতিমাশিল্পের মূল মানদণ্ড। কোনও বিশেষ আঙ্গিক পদ্ধতি নিয়ে চুলচেরা বিচার ছিল না। শিল্পীতে সাধকে যেন আত্মার লেনদেন।

'ইদানীং প্রতিমাশিল্পের ক্ষেত্রে হাওয়া বদল হতে শুরু করেছে। প্রতিমা তৈরির আঙ্গিকগত সার্থকতা যাচাই করে পাটোয়ারী মাপজোঁক শিল্পীদের বিভ্রান্তি বাড়াচ্ছে। কোনও প্রতিমা সার্থক, কোনও প্রতিমা সার্থক নয় এইরকম তর্ক-বিতর্কে শিল্পীরা পড়েছেন ফ্যাসাদে। তর্ক-বিতর্ক যাঁরা করেন তাঁরা জানেন না প্রতিমাশিল্পের আদি পর্বের কথা।

'প্রতিমাশিল্পের ক্ষেত্রে এমন কোনও শাস্ত্র নেই, রূপকার নেই যিনি ঋজু ভাষায় বলতে পারেন সার্থক প্রতিমা এই। শিল্পী জানেন, যে মূর্তিতে সত্য-শিব-সুন্দরের রূপ পরিপূর্ণ সেই মূর্তিই সার্থক। তার আঙ্গিক, প্রকরণ পদ্ধতি যাই হোক না কেন, কোনোটাই অচল নয়।

'মায়ের মূর্তি দেখে যখন দুচোখ জলে ভরে আসে, তখন কি কারও মনে প্রশ্ন জাগে, এটি কোনও টেকনিকের প্রতিমা? জাগে না। শুকনো পাণ্ডিত্যের দুয়ার সেখানে বন্ধ। সমস্ত তর্কের সেখানে অবসান। তর্ক ওঠে কোথায়? যেখানে প্রাণ নেই, প্রয়াস আছে, অপূর্ণতা যেখানে ঢাকা পড়ে গেছে চাকচিক্যের বহরে।

'আমি মনে করি, ভারতের ভাস্কর্য রীতি, বাংলার বিশেষ রীতি—কিংবা আধুনিক ধারা যাই হোক না কেন, সকল ধারার মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রতিমাশিল্পের জীবন-জাহ্নবী। পূর্ণ প্রাণের নিষ্ঠা নিয়ে তাকে ধারণ করতে পারলেই সৃষ্টি সার্থক হবে। যে শিল্পী ষোলো আনা আকুলতা নিয়ে প্রতিমা নির্মাণে মেতে ওঠেন, তিনি নকলনবিশি করেন না। তাঁর সৃষ্টিতে লাগে মৌলিকতার মহিমা, লাগে সৃজনশীল উপলব্ধির স্পর্শ।

'প্রশ্ন জাগে তার পরেও। প্রতিমার অলৌকিকতার একটা ছাপ তো থাকা চাই। ভয় থেকে ভক্তির উদ্ভব। ভয়ের একটা বিশেষ ব্যঞ্জনা থাকবে এমনতর কথাও প্রায়ই শুনি। দেবী তো লৌকিক নন, অলৌকিক। এইজন্যেই আমি অলৌকিকতার আভাস দিতে চেষ্টা করি দেবীর বিভূতি বৈভবের রূপচ্ছায়ায়। তাই সাজাতে হবে তাঁকে আনন্দের সাজে, উৎসবের সাজে, কল্যাণের সাজে।

'শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোকে জেনেছি, দেবীর কাছে চাইলে পাব সৌন্দর্য, বীর্য, কল্যাণ, ঐশ্বর্য, ভক্তি, মুক্তি। এদের দিব্য জ্যোতিতেই তিনি জ্যোতিরূপা। এই রূপকে বাস্তবায়িত করলেই দেবীকে কল্যাণদায়িনী মনে হবে। অবশ্য সমকালের পরিচয় সব সাধনাতেই থাকে। প্রতিমাশিল্পেও থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিকতা ও বিবর্তনের নামে ঐতিহ্যভ্রষ্ট ও কৌলীন্যভ্রষ্ট হওয়ার অধিকার কারোরই নেই। সেরকম প্রয়াস শিল্প-ভ্রষ্টতারই নামান্তর।

'তবে এ কথা ঠিক, একটি মানুষ যতদিন তার কল্পনা ও মানসিক সৃষ্টিশক্তি নিয়ে পৃথিবীর মাটিতে বেঁচে থাকবে, দেবদেবীর ধ্যান, রূপ, প্রতিমার শৈল্পিক ক্রমোন্নতি ও বিবর্তন ততদিন চলতেই থাকবে। সৃষ্টি বিকাশের ধারাই এই।

'তবু আকস্মিকতায় আমি বিশ্বাস করি না। সে আকস্মিকতা যদি আধুনিকতার ছদ্মবেশে আছে, তা হলেও না। কেননা প্রতিমা হল ধর্মীয় ভাস্কর্য। ধ্যানে ও ধারণায় পরিবর্তন না হলে কেবল শিল্পের স্বাধীন বিকাশ ও বিবর্তনের খাতিরে সেখানে অসহনীয় কিছু করা যায় না।'

রমেশবাবুর ওই কথাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন সাম্প্রতিককালের সবচাইতে বিতর্কিত প্রতিমা শিল্পী ও ভাস্কর অলক সেন। সত্তরের দশকে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া এই ভাস্কর ও শিল্পী প্রতিমাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত দীর্ঘ দেড় যুগ ধরে।

চল্লিশোর্ধ এই শিল্পীর কাছে বিবর্তন হল অনেকটা পোশাক বদলের মতো। প্রতিমাশিল্পে বিবর্তন এই পোশাক বদল।

অলকবাবু বললেন, 'দেখুন, আজ থেকে ৬০/৭০ বছর আগেও একই চালির মধ্যে দুর্গা মূর্তি হত। প্রতিমার সাজপোশাকে তখন এতই চাকচিক্য ছিল যে, প্রতিমার আসল রূপটাই তাতে ঢাকা পড়ে যেত।

'প্রথম এই এক চালির ব্যাপারটাকে আজ থেকে বছর পঞ্চাশেক আগে প্রথম ভাঙেন গোপেশ্বর পাল। তিনই প্রথম এক চালিকে ভেঙে কার্তিক, গণেশকে আলাদা করে পাঁচটি ভাগ করেন। এর সঙ্গে উনিই প্রথম ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে পাহাড়, পর্বত ইত্যাদির আমদানি করেন। এই বিবর্তন নিয়ে সেকালে অনেক বিরূপ সমালোচনাই তাঁকে হজম করতে হয়েছিল।

'একালের প্রতিমশিল্পে পুরোপুরি আধুনিকতার জোয়ার এনেছিলেন শ্রদ্ধেয় রমেশ পাল। রমেশবাবুই মূর্তির কাজে শোলার এবং ডাকের কাজের মিশ্রণ ঘটিয়ে অসম্ভব সুন্দর এক শিল্প ঘরানার সৃষ্টি করেছিলেন। যদিও এ ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন বিখ্যাত শোলা শিল্পী অনন্ত মালাকার। আরেক প্রতিমাশিল্পী সুনীল পাল ইন্ডিয়ান আর্টের উপর প্রতিমা নির্মাণ করে একসময় প্রশংসিত হয়েছিলেন।

'ব্যাপকভাবে ব্যাকগ্রাউণ্ডে ইণ্ডিয়ান পেইনটিংকে আমিই প্রথম কাজে লাগাই। একই ব্যাকগ্রাউণ্ডে প্রতিমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় সৃষ্টি করে দর্শক মনে এক সময় প্রবল আলোড়নও তুলেছিলাম।

'আমি প্রতিমাশিল্পে প্রথম বিবর্তন আনি ১৯৭৩ সালে। সে সময় শিয়ালদার নয়াপল্লীতে একটি দুর্গা প্রতিমা করি ৬টি রিপুকে উপজীব্য করে। তাতে আমি একই সঙ্গে ৬টি অসুরকে সৃষ্টি করি। এখানে আমি অসুরকে রিপুর প্রতীক হিসেবেই দেখিয়েছি। আর তা করতে গিয়ে আমাকে মেটাল কালার, পাথর, উডেন এবং সিরামিক এফেক্ট ব্যবহার করতে হয়।

'বিগত '৭৬ সাল থেকে মহম্মদ আলি পার্কের ঠাকুর ছেদহীনভাবে করে আসছি আমি। প্রথম বছর আমি দুর্গাকে মধ্যিখানে রেখে অসংখ্য অসুরকে মালার মতো রাউণ্ড করে দুর্গার চারিদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম। আসলে আমাদেরকে যে সামাজিক আসুরিক শক্তি চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে এই মূর্তি রচনার মধ্য দিয়ে আমি তাই বলতে চেয়েছি।

'পরবর্তী বছরে এই অসুরকেই আমি একটি সদ্যোজাত শিশু হিসেবে দেখিয়েছিলাম। দেবী দুর্গাকেও আমি কোনও অস্ত্রে সজ্জিত করিনি। অনেক পণ্ডিত এই মূর্তি গড়া নিয়ে আমাকে তীব্র সমালোচনা ও আক্রমণ করেছিলেন। আমি তাঁদের উদ্দেশ্য সবিনয়ে চণ্ডী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছিলাম, যতক্ষণ নিজের মধ্যে অহমিকা থাকবে ততক্ষণ সে

পবিত্র নয়। অসুর শেষ মুহূর্তে আত্মসমর্পণ করে পবিত্র হয়েছিল। অর্থাৎ সে পবিত্রতার মধ্যে দিয়ে নিষ্পাপ শিশুর মতোই হতে পেরেছিল। তাই দেবী দুর্গার এক হাতে ছিল শঙ্খ অন্য হাতে বরাভয়। দুজন দুজনার দিকে আকুলতায় দু-হাত প্রসারিত করে রেখেছে।

'এরকমই এক আক্রমণের মুখোমুখি আমায় হতে হয়েছিল বঙ্গবাসী কলেজের সামনে সরস্বতী ঠাকুর গড়া নিয়ে। সেবার আমি সরস্বতীকে চারিদিক থেকে শৃঙ্খল বেষ্টিত অবস্থায় গড়েছিলাম। যে শিকল পেছন থেকে টেনে রেখেছে একটি দানবীয় হাত। অর্থাৎ একথাই আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম শিক্ষা ব্যবস্থা আজ রাজনীতির করাল গ্রাসে এভাবেই শৃঙ্খলিত। যে শৃঙ্খল ধরে রেখেছে নোংরা রাজনীতিকেরা।

'আসলে আমি যখন যে প্রতিমা গড়ি না কেন, তাতে সাম্প্রতিককালের সামাজিক চিন্তা-ভাবনার একটা দৃঢ় ছাপ রাখার চেষ্টা করি। ফলে প্রতি বছরই আমার প্রতিমা শিল্পে কিছু না কিছু বিবর্তনের ছাপ পড়েই। তবে একথা ঠিক, মূল প্রতিমাকে আমি কখনও বদলাবার চেষ্টা করি না। অর্থাৎ তার আসল রূপকে।

'এই বিবর্তনকে যাঁরা ভ্রষ্টাচার বলছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার একটা কথাই বলার আছে, একই জমিতে একই ধান যদি বছরে তিনবার ফলে এবং তা যদি তাঁরা আনন্দ সহকারে খেতে পারেন তবে এই বিবর্তনকে তাঁরা কেন সহজভাবে নিতে পারছেন না?

'প্রতিমাশিল্প হল ভাবের শিল্প, ভাবনার শিল্প। নিজেকে মানুষ যেমন নিত্যনিয়ত নতুনভাবে আবিষ্কার করে, প্রতিটি প্রতিমাকে সেই নিত্যনতুন রূপে আবিষ্কার করাই হল একজন দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সৃষ্টিশীল প্রতিমাশিল্পীর কাজ।'

এভাবেই কথা আরম্ভ করেছিলেন ত্রিশ স্পর্শ করা শিল্পী বাসুদের রুদ্র পাল। ইনি বিখ্যাত প্রতিমাশিল্পী রাখালচন্দ্র রুদ্র পালের ভাইপো।

খুব ছেলেবেলা থেকেই ঠাকুর গড়ছেন বাসুদেববাবু। তাঁর হাতে গড়া টানটান মূর্তির মতোই তাঁর বক্তব্যও ঋজু ও টানটান। তাঁর বক্তব্য—'এই কুমারটুলিতে যাঁরা প্রতিমা গড়েন তাঁরা কেউই চণ্ডী কিংবা পুরাণ নিয়ে অত ভাবনাচিন্তা করেন না। চণ্ডীকে মেনে বা পুরাণকে মেনে প্রতিমা গড়তে গেলে ঠাকুরের টানাটানা চোখ, বসন, সিংহ, অসুর সবই পৌরাণিক কায়দায় করতে হয়। কলকাতাতে এ মূর্তি তৈরি করলে তা দেখার জন্য ভিড় হবে বলে আমার মনে হয় না।

'প্রতিমাশিল্পে সেই বিবর্তন মানুষকে আকর্ষণ করার একটা উপায়। একই জিনিসের পৌনঃপুনিকতা মানুষের একঘেয়েমির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিবর্তন হল সেই স্বাদ বদলের অন্যতম মাধ্যম।

'আমি নিজে প্রতিমায় এমন কিছু করি না যা প্রাচীন কৌলীন্যকে আঘাত করে। প্রতিমার আশেপাশের জিনিসের মধ্যেই এই বিবর্তনকে আমি সীমাবদ্ধ রেখেছি। ফলে প্রতিমার যথেচ্ছাচার ঘটছে একথা কেউ বলতে পারবেন না।'

১৯৮৭ সালে এশিয়ান পেইন্টস পুরস্কার পাওয়া শ্রেষ্ঠ প্রতিমাশিল্পী তেষট্টি বছর বয়স্ক

মোহনবাঁশি পাল জানালেন—'সমস্ত মূর্তি এবং ধ্যান মিলিয়েই ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ভিন্ন জনের হাতে ভিন্নভাবে ঘটে থাকে। একজন প্রতিমাশিল্প তো অন্যজনের কার্বন কবি নন যে একইরকম প্রতিমা গড়বেন।

'এই যে আমি যুবক বয়সে যেরকম ছিলাম, আমার চিন্তা-ভাবনা যেমন ছিল, তা কি এই বৃদ্ধ বয়সেও একইরকম আছে? আমার বয়সের পূর্ণতা আমার অনেক কিছুকেই বদলে দিয়েছে। যার প্রতিফলন আমার জীবনযাপন ঘটছে। প্রতিমাশিল্পেও তার ছাপ নিশ্চয় পড়েছে। এই যে বার বার বদলান, এই যে ভেঙে গড়া এটাই তো বিবর্তন। যে জামার ছিটটা আমি নিতান্ত যুবক বয়সে কিংবা কিশোর বয়সে পড়তাম তা কি এখন পরলে মানায়? বোধহয় না। অথচ লোকটা কিন্তু সেই একই।

'প্রতিমাও তাই। আমার হাতে কিংবা অন্য সবার হাতে আদিকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত যে বহিরঙ্গের রূপ বদল ঘটেছে তাকেই বিবর্তন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

'অনেক প্রাচীন মানুষকেই অনুযোগ ও সমালোচনা করতে শুনি যে, প্রতিমার সেই টানা টানা চোখ, লম্বা ঘাড়, ঘোড়ার মতো মুখ, কতকটা মকবের মতো সাদা, রোগা, টানা ও লম্বা অলৌকিক সিংহ, অমিত তেজ অসুর সবারই আধুনিকতার ছোঁয়ায় নাকি গঙ্গাযাত্রা ঘটে গেছে। প্রতিমাশিল্পে আধুনিকতার নামে নাকি ভ্রষ্টাচার চলছে। আসলে আমি যখন নিতান্ত বালক ছিলাম তখনও এরকম কথা প্রাচীনদের ও পণ্ডিতদের মুখে অনেক শুনেছি। আজ যখন আমি নিজে বৃদ্ধ, তখনও (একজন প্রতিমাশিল্পী হিসেবে) একথা শুনেছি। আজ যে নিতান্ত শিশু সেও তার কালে একই কথা শুনবে। বিবর্তনের ধারাই এই। যতদিন সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে বিবর্তন চলতে থাকবে ততদিন এই একই সমালোচনার হাতুড়ি স্রষ্টাকে বার বার আঘাত করবে। স্রষ্টা সমস্ত আঘাতকে উপেক্ষা করেই কালে কালে এভাবেই শিল্পকে অমরাবতীর নন্দনলোকে পৌঁছে দেবেন। স্রষ্টা হিসেবে এটাই তো তাঁর একমাত্র কর্তব্য।'

শারদীয় পরিবর্তন, ১৩৯৬